Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501036 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

A narration on the Style of Tagore's Plays: In Light of Aristotle's 'Poetics'
রবীন্দ্রনাটকের আঙ্গিক সম্পর্কে কয়েকটি কথা: অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স গ্রন্থের আলোকে

Rafika Khatun
Researcher
Bengali Department, Gauhati University
Assam

Received on: 05th March 2026
Accepted on: 18th March 2026

Abstract:
The subject — "A Discussion on the Formal Aspects of Rabindra Drama in Light of Aristotle's 'Poetics" — holds immense significance. Aristotle asserted that six specific elements are indispensable to the composition of a drama. In doing so, he conveyed a guiding principle regarding the methodology a playwright ought to adopt. Indeed, the vast majority of playwrights adhere to this convention; Rabindranath Tagore is no exception, for he, too, followed Aristotle's precepts. However, he simultaneously cultivated a distinctive style of his own; rather than merely imitating Western dramatic forms, he infused his writing with a unique identity. Throughout his oeuvre, one consistently observes an evolving nature in Rabindra drama. In the present essay, the various formal aspects of Rabindra drama have been analysed through the lens of Aristotle's 'Poetics'.

Key Words:
Rabindra Drama, Aristotle's Poetics, Society, six specific elements.

মূল প্রবন্ধ

ভূমিকা

'রবীন্দ্রনাটকের আঙ্গিক সম্পর্কে কয়েকটি কথা আলোচনা অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স কাব্যের আলোকে' বিষয়টি খুব গুরুত্ব। অ্যারিস্টট্‌ল নাটক রচনার ক্ষেত্রে ছয়টি উপাদান যে অপরিহার্য সেই কথা বলেছেন। একজন নাট্যকারকে কীভাবে নাটক রচনা করতে হবে সেই বিষয়ে একটা বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। অবশ্য প্রায় নাট্যকার এই রীতিকে অনুসরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ব্যাতিক্রম নন। তিনিও অ্যারিস্টটলের কথাগুলিকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু নিজস্ব রীতিতে অনুসরণ করেছেন। শুধুমাত্র পাশ্চাত্য নাটককে অনুকরণ নয়, নিজের পরিচয় রেখেছেন লেখার মধ্যে। তাই সব সময় রবীন্দ্র নাটকের পরিবর্তিত রূপ লক্ষ করি। কখনো পাঁচ অঙ্কে বিন্যস্ত করেছেন নাটককে যেমন 'রাজা ও রানী' নাটকটি। আবার কখনো শুধুমাত্র দৃশ্য বিভাজন করেছেন নাটকের যা বিভিন্ন নাটকের মধ্যে দেখা যায়। আলোচনার বিষয়, পোয়েটিক্সকে কোথাও তিনি মেনে নিচ্ছেন কোনো দ্বিধা না রেখে, আবার কখনো বলছেন গ্রিক নাটক আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি রূপে পরিচিতি লাভ করলেও নাটক রচনার ক্ষেত্রে কবির বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। তিনি প্রথম জীবনে যেসব নাটকগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি পাঁচটি অঙ্কে বিনস্ত। শেষ পর্যন্ত সেই রীতিকে অনুসরণ করেন নি। অ্যারিস্টটল নাটক রচনার ছয়টি উপাদানের কথা বলেছেন তা রবীন্দ্রনাটকেও লক্ষ করা যায়। তবে সেই উপাদানগুলিকে নিজের মতো করে সাজিয়েছেন। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে ষষ্ঠ অধ্যায় উল্লেখ করেছেন — "ট্রাজেডি গঠিত হয় ছটি উপাদানে:

© Santiniketan Sahityapath

কাহিনী, চরিত্র, রচনারীতি, অভিপ্রায়, দৃশ্য ও সঙ্গীত। এর দুটি হল অনুকরণের মাধ্যম, একটি হল অনুকরণের রীতি, আর (বাকি) তিনটি অনুকরণের বিষয়। এ ছাড়া আর কোন উপাদান নেই। বলা চলে যে বেশির ভাগ কবিই এই উপাদানগুলি ব্যবহার করেন, প্রত্যেক নাটকেই মোটামুটি দেখা যায় এই উপাদানগুলির ব্যবহার — দৃশ্য, চরিত্র, কাহিনী, ভাষারীতি, সঙ্গীত আর অভিপ্রায়।"[১]

রবীন্দ্রনাটকের ক্ষেত্রে উপাদানগুলি লক্ষ করা গেলেও তিনি পাশ্চাত্যের নাটকের বৈশিষ্ট সম্পর্ণ অনুকরণ করেন নি। তাঁর রচিত প্রথম পঞ্চাঙ্ক নাটক হলো 'রাজা ও রানী'। এরপর 'বিসর্জন' লিখেছেন। 'বিসর্জন' নাটক সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মত হলো, "রূপক-সাংকেতিক গণ্ডির বাহিরে যে-সমস্ত নাটক আছে, তাহাদের মধ্যে সকল দিক দিয়াই বিসর্জন নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।"[২]

আবার যখন ধীরে ধীরে নাটক রচনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তখন তাঁর নাটকের আঙ্গিকগত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। নাটকের ছয়টি উপাদানের মধ্যে তিনি কাহিনিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, সমানার্থে চরিত্রকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। নাটকের পাঁচটি অঙ্ক বিভাগ আর পরবর্তী নাটকগুলিতে প্রয়োগ করেন নি। 'অচলায়তন' নাটকে ছয়টি দৃশ্য লক্ষ করা যায়। এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'গুরু' নাটককে পরবর্তীতে চারটি দৃশ্য বিভাগ করেছেন। 'রক্তকরবী'র মতো নাটকের দৃশ্যভাগ করেছেন। শুধু দৃশ্যভাগের ক্ষেত্রে নয়, নাটকের নামকরণ, চরিত্রের নামকরণ ব্যাপারে অনেক রকমভাবে ভেবেছিলেন। একটি নাটকের একাধিকবার নামকরণ করেছেন। মনঃপূত না হওয়া পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। তাই 'রক্তকরবী' নাটকের দশটি পাণ্ডুলিপি পাই। চরিত্র সৃষ্টির দিকটা বিশেষ করে কিশোর চরিত্রকে নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে, নয়টি পাণ্ডুলিপিতে আমরা কিশোর চরিত্রকে পাই না। আবার দশম পাণ্ডুলিপিতে পেয়ে থাকি। এমন ভাবে তিনি কিশোর চরিত্র অঙ্কন করেছেন যার মধ্যে দিয়ে নাটকের কাহিনি শুরু হচ্ছে এবং শেষ হচ্ছে সে-ই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। নাটকের সূচনা এই রূপ,

> "কিশোর। তুমি-যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজেপেতে একজায়গায় জঞ্জালের পিছনে একটিমাত্র গাছ পেয়েছি।
>
> নন্দিনী। আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে আনব।
>
> কিশোর। অমন কথা বোলো না। নন্দিনী, নিষ্ঠুর হোয়ো না। ঐ গাছটি থাক আমার একটি মাত্র গোপন কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, সে আমারই নিজের ফুল।... একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে-মনে ভাবি।"[৩]

আর নাটকের ক্লাইম্যাক্স পর্যায়ে পৌঁছে আমরা দেখতে পাই কিশোরের মৃত্যু। আর কিশোরের মৃত্যু নন্দিনীকে বিদ্রোহিনী করে তুলেছে।

নাটকের অভিপ্রায়, রচনারীতি, দৃশ্যবিভাগ বিশেষ করে সংগীত রবীন্দ্রনাটকের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রায় প্রত্যেক নাটকে তিনি গান সৃষ্টি করেছেন। প্রথম জীবনে যে সকল গান রচনা করেছেন তার মধ্যে আমরা পেয়ে যাই 'বাল্মীকিপ্রতিভা' আর 'মায়ার খেলা'। দুটোই তাঁর গীতিনাট্য। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বলছেন — "এই দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যাবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়েছিলেন তাঁহারা, আশা করি, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসঙ্গত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব।"[৪]

কাহিনি পর্যালোচনা

একটি নাটক রচনার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন নাটকের অঙ্গ হলো কাহিনি। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে বলছেন — "এইসব উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ঘটনার সজ্জা কারণ ট্রাজেডি মানুষের অনুকরণ নয়, ট্রাজেডি একটি ক্রিয়ার অনুকরণ,... তাছাড়া ক্রিয়া বাদ দিলে ট্রাজেডি অসম্ভব, কিন্তু চরিত্র বাদ দিয়ে সম্ভব।"[৫] আসলে চরিত্র বাদ দিয়েও ট্রাজেডি সম্ভব নয়। কিন্তু অ্যারিস্টটল কাহিনির অতিরিক্ত গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে উপরিউক্ত উক্তিটি করেছিলেন। তিনি চরিত্রের চাইতে কাহিনিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি কাহিনি সৃষ্টিতে ঐতিহাসিক ব্যাক্তিকে সংগ্রহ করেছিলেন। পুরাণ থেকেও চরিত্র সংগ্রহ করে নাটক

রচনা করেছেন। নাট্য জগতে প্রবেশ করেন 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নামক নাটক দিয়ে। যেখানে একজন দস্যু থেকে বাল্মীকির কবি হয়ে ওঠার কাহিনি বর্ণনা রয়েছে। মা সরস্বতী বিদ্যা দিয়ে তাঁকে সঠিক পথে নিয়ে আসছেন। মধুসূদন দত্ত যখন 'শর্মিষ্ঠা' লিখছেন তিনি সরাসরি পুরাণকে অনুসরণ করছেন আর পাশ্চাত্য রীতির ভিত্তিতে পাঁচটি অঙ্কে বিভাগ করে নাটক লিখেছেন। এমনকি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন 'শাজাহান' নাটক লিখেছেন, তখন তিনিও নাটককে পাঁচটি অঙ্কে ভাগ করেছেন আর তার মধ্যে দৃশ্য সজ্জা রয়েছে। এঁদের নাটক থেকে রবীন্দ্রনাটক স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ রচিত নাটকগুলিকে গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, রূপক-সাংকেতিক নাটকের পর্যায়ে ফেলা যায়। ঐতিহাসিক বা পৌরণীয় নাটক বলা যায় না। অথচ 'রাজর্ষি' উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে তিনি ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে নিয়ে 'বিসর্জন' নাটক লিখেছেন। নাটকটি ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে করেছেন — "স্বপ্ন দেখিলাম, কোনো-এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটা বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাবা, এ কি! এ-যে রক্ত!" বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে — জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে — পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরও আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতে লাগিলাম।"[৬]

'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে দেখা যায় সেখানে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব রয়েছে পরবর্তীকালে নাট্যরূপ দিয়েছেন 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক। 'প্রায়শ্চিত্ত'কে আবার 'পরিত্রাণ'এ রূপ দিচ্ছেন। প্রথমে উপন্যাস তারপর নাটকে রূপান্তর করেছেন। রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রমথনাথ বিশী এমনকি শঙ্খ ঘোষ 'কালের মাত্র ও রবীন্দ্রনাথ নাটক' গ্রন্থে এই নাটকটিকে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক নাটক রূপে চিহ্নিত করেন নি। অতএব বলা যায় তাঁর নাটকে পুরাণ ইতিহাস উভয় এসেছে তবে সেটাকে বাকি নাট্যকারের মতো সরাসরি নিয়ে আসেন নি। নিজের সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন।

চরিত্র সৃষ্টিতে নৈপুণ্যতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন কাহিনিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি চরিত্র সৃষ্টিতে নৈপুণ্যতা দেখিয়েছেন। চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর নিজস্বতা লক্ষ করা যায়। কেননা আমরা ভূমিকা অংশে আলোচনা করেছি রক্তকরবী নাটকের কিশোর চরিত্রটিকে। নাটকের নয়টি পাণ্ডুলিপিতে কিশোরের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। দশম পাণ্ডুলিপিতে এমন করে অঙ্কন করেছেন পাঠ করে মনে হয় কিশোর চরিত্র না থাকলে রক্তকরবী নাটকের পরিণতিই লাভ করত না। শুধুমাত্র চরিত্র সৃষ্টি নয় চরিত্রের নামকরণের ক্ষেত্রেও অনেক ভাবনা কাজ করেছে। সুনন্দা, খঞ্জিনি পরে আমরা নন্দিনী নামটি পেয়ে থাকি। নায়ক-নায়িকা নয়, নায়ক নায়িকার পাশাপাশি তিনি যে বিশু পাগল, ধনঞ্জয় বৈরাগী, দাদাঠাকুর যিনি গুরু তিনিই গোসাই ঠাকুর এরকম চরিত্র বাংলা সাহিত্যে কমই সৃষ্টি হয়েছে। 'অচলায়তন' নাটক নিয়ে উপেন্দ্রনাথ বলছেন — "বহুদিন হইতে অচলায়তনের প্রতিষ্ঠাতা-গুরু অচলায়তন পরিদর্শনে আসিবেন বলিয়া সংবাদ রটিয়াছে। সকলেই গুরুর আগমনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। এমন সময় দাদাঠাকুরই গুরুরূপে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তাঁহার অস্ত্রধারী শোনপাংশুর দল। গুরুর আদেশে দীর্ঘ উচ্চ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করা হইল। আকাশের অপর্যাপ্ত আলো-বাতাস তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।"[৭]

চরিত্রকে ছেঁটে বাদ দেওয়া ও নব চরিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ দক্ষ ব্যক্তি। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের কাহিনিতে গুণবতী এবং অপর্ণা চরিত্রটি আমরা দেখতে পাই না। তিনি নাটকের মধ্যে নিয়ে এলেন চরিত্র দুটিকে। হাসি নামক মেয়েটি উপন্যাসে ঠিক ছিল। তবে উপন্যাসের শুরুতে হাসির মৃত্যু হয়। তাকে অপর্ণার সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। কেননা অপর্ণা কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকের মধ্যে থেকেছে। রঘুপতির আত্ম অভিমান না ভাঙা পর্যন্ত নাটকে উপস্থিত থেকেছে। শেষপর্যন্ত রঘুপতিকে মন্দির থেকে বের করে নিয়ে আসে —

"অপর্ণা। পিতা!

রঘুপতি। জননী, জননী, জননী আমার! পিতা! এ তো নহে ভর্তসনার নাম। পিতা! মা জননী, এ পুত্রঘাতীরে পিতা ব'লে যে জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে ওই সুধামাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটুকু দয়া করে গেছে। আহা, ডাক আরবার।

অপর্ণা। পিতা, এসো এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা।"[৮]

© Santiniketan Sahityapath

আরো একটি নাটক আলোচ্য 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে যে সুরমা চরিত্রটি পাই, 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে রবীন্দ্রনাথ তাকে সম্পূর্ণ অর্থে প্রত্যাখ্যান করেছেন। নিজের মতো করে তিনি আর একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। একপ্রকার ক্ষ্যাপা চরিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতা লক্ষ করা যায় যা বাংলা সাহিত্যের নতুন সৃষ্টি বলা যেতে পারে। রবীন্দ্র-সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী যে-সকল নাট্যকার ছিলেন তাঁদের নাটকের মধ্যে এই 'রক্তকরবী' নাটকের বিশু যাকে নন্দিনী পাগল ভাই বলতেন, এই রূপ চরিত্র সৃষ্টি করেন নি। যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'সাজাহান' নাটকে দিলদার চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। চরিত্রটি ভাঁড়, কিন্তু বলছেন দার্শনিক কথাবার্তা। তাই সাজাহানের বড়ো পুত্র দারা বলছেন — "দারা। তুমি একজন দার্শনিক দেখছি যুবক!"[৯] যে ভাঁড় চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন দিলদার, তার বিশেষত্ব রয়েছে দার্শনিক কথাবার্তায়। সত্য কথা বলে গেছেন রূপকের আড়ালে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত 'জনা' নাটকে যে বিদূষক চরিত্রটি আমরা পাই, সেখানে বিদূষক নিন্দার ছলে শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করে চলেছেন — "পাথর চাপালেন মা-বাপের বুকে, তারপর বৃন্দাবনে ঝুঁকে গোপ-গোপিনীর হাড়ির হাল, যশোদা মাগী নাকাল, অবোধ রাখাল কেঁদে সারা নন্দ মিনসে দিশেহারা! আর রাধা? তাঁর কাঁদা সার, একশো বছর দেখলেন আঁধার, এদিকে দয়াময় হরি যমুনা পার, কান দেন না কথায় কার, যেন কারুর কখনও ধারেন না ধার!"[১০] গিরিশচন্দ্র ঘোষের এই বিদূষক চরিত্রের মতো কিন্তু ধনঞ্জয় বৈরাগী বা বিশুপাগল বা দাদাঠাকুর নয়। তারা একেবারে মাটির মানুষ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে জায়গা দিয়েছেন এই ধরণের চরিত্রের। যেখানে 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর একটি উক্তি হচ্ছে সোজা ভাষায় সোজা কথা — "রাজা হলেই রাজাসনে বসে, রাজাসনে বসলেই রাজা হয় না।"[১১] রাজনৈতিক চক্রান্তের জন্য এরকম কথা বলতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত চরিত্রটি সাহসী, সত্যবাদী যার মধ্যে চরিত্রের কঠিন কোমল উভয় রূপই বর্তমান রয়েছে।

রবীন্দ্র নাটকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংগীত

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে সব থেকে আকর্ষণীয় দিক হলো সংগীত। অ্যারিস্টটল তাঁর poetics গ্রন্থে বলেছেন — "ট্রাজেডির সবচেয়ে প্রীতিকর উপাদান হলো সংগীত।"[১২] গান যেমন আমাদের জীবনে গতি নিয়ে আসে ঠিক তেমনি একই কথা নাটকের ক্ষেত্রেও খাটে। একঘেয়েমি কাটানোর জন্য শুধু গানের ব্যবহার করেন নি, পাশাপাশি নাটকের কাহিনি ও চরিত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে গান সৃষ্টি করেছেন। কেননা বিশু যে কথাগুলি নন্দিনীকে সংলাপে বলতে পারেনি তা গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। এই গানই নাটকের বিষয়গুলিকে আর অভিনব রূপে ফুটিয়ে তুলতে পারে। 'রক্তকরবী' নাটকের বিশু পাগল গানের মধ্যে দিয়ে তার ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছে —

"ভালোবাসি ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।"[১৩]

এই গানটি নন্দিনী বিশুর কাছ থেকে শুনেছে। আবার রাজাকে শোনাচ্ছে নন্দিনী। রাজা এই ধরণের গান শুনতে চায় না। কেননা নিজের অবস্থান থেকে নড়তে নারাজ। গানই পারে মানুষের মধ্যে সজীবতা নিয়ে আসতে। রস সঞ্চার করতে। তাই রবীন্দ্রনাটকে গানের গুরুত্ব খুব বেশি। গীতিনাট্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' হলেও পরবর্তীতে প্রায় বেশিরভাগ নাটকে গান জুড়ে দিয়েছেন। ট্রাজেডি রচনা করতে গিয়েও গানের প্রয়োগ করেছেন। বলা যেতেই পারে এই গান সৃষ্টি গ্রিক নাটকের কোরাসের মতো। অ্যারিস্টটল যেমন সংগীতকে নাটকের সবচেয়ে প্রীতিকর উপাদান বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও গানকে নাটকের প্রধান বিষয় করে তুলেছেন। প্রমথনাথ বিশীর মত — "রবীন্দ্রনাথ মায়ার খেলার আগেও গান রচনা করিয়েছেন, কিন্তু মায়ার খেলায় আসিয়া তাঁহার গানের কলম যেন খুলিয়া গিয়াছে; তাহার কারণ, এতদিনে তিনি তাঁহার প্রতিভার অনুকূল জীবনবস্তু খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া 'tour-de-force' কিন্তু মায়ার খেলাতে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সাঙ্গীতিক প্রতিভার প্রথম ও অসংশায়িত উন্মেষ।"[১৪]

দৃশ্য সজ্জা

অ্যারিস্টটলের মতে, "... তাছাড়া দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারটা কবির নয়, অলংকরণকারীর।"[১৫] কোনো একটা নাটককে অভিনয়ের জন্য মঞ্চস্থ করতে হয়। সেটা কিরূপ হবে তার ব্যাপারটা কোনো নাট্যকার বলে দেবেন না। সেটা যিনি ডিরেক্টর হবেন তাঁর মত অনুযায়ী মঞ্চ সেজে উঠবে। খুব প্রাচীনকালে যাত্রা পালা হতো আমাদের দেশে, সেখানে কোনো দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন গাইতে গাইতে নৃত্যের

মাধ্যমে ব্যাপারটা হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে শখের থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হলো তখন নির্দিষ্ট একটি স্থানে মঞ্চ সাজিয়ে নাটককে উপস্থাপন করা হতো। অজিতকুমার ঘোষের মতে, ''নবীনচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের বহু দৃশ্য চিত্রায়িত করিয়া দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়েছিলেন। নাটকীয় দৃশ্যের অনুকূল আবহ শব্দ সৃষ্টি করিয়া তিনি অভিনয়ে বাস্তবতা আনিয়াছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম রঙ্গামঞ্চে স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় ধারার প্রবর্তন করেন।''[১৬] রঙ্গামঞ্চের বিস্তৃত ইতিহাস রয়েছে। তার রূপ ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে। শখের নাট্যশালার একরূপ ছিল, আবার রুশ নাট্যকার লেবেডেফ তিন দিক ঘেরা প্রসেনিয়ম থিয়েটারের কথা বলেন। সেখানে দর্শক সামনের দিকে বসে মঞ্চের অভিনয় উপভোগ করবে। তারপর বাদল সরকার একপ্রকার মঞ্চের কথা বলেন নাটককে খোলা মাঠেই অভিনয় করা যায় তাঁর মতে। যাই হোক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দৃশ্যসজ্জা ব্যাপারটা অনেকটা শিখেছিলেন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। মঞ্চকে নাটকের উপযোগী হতে হবে। তার জন্য পাখি শিকার করে এনে ডালে বসাতেও স্বীকার। কিছু পরিমাণ ঘাস ও গাছের ডাল কেটে তার উপর মরা পাখিটি রেখে দিলে উপযুক্ত স্থান হয়। রবীন্দ্রনাথ মঞ্চসজ্জা ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছেন। এবং তিনি স্বয়ং মঞ্চে অভিনয় করেছেন। 'জীবনস্মৃতি' বইতে উল্লেখ করেছেন — ''আমার বিলাত যাইবার আগে হইতে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জনসমাগম নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত। সেই সম্মিলনে গীতবাদ্য কবিতা আবৃত্তি ও আহারের আয়োজন থাকিত।... এই সম্মিলনী উপলক্ষেই বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত হয়। আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রাতুষপুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়েছিল; বাল্মীকিপ্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।''[১৭]

রচনা রীতি

প্রত্যেক সাহিত্যের সাহিত্য রচনার নির্দিষ্ট রীতি রয়েছে। যেটা প্রত্যেক সাহিত্যিককে একে অপরের থেকে আলাদা করে। রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন। যদি তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারের সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে লক্ষ করা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ কাউকে অনুসরণ না করে নিজস্ব ঢঙে নাটক রচনা করেছেন। প্রথম দিকে অবশ্যই পাঁচ অঙ্কে বিভাগ করে তার মধ্যে দৃশ্য বিভাগ করেছেন। যা সমসাময়িক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নতুন রাস্তা তৈরি করলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'অচলায়তন' নাটকের মধ্যে লক্ষ করি। পরবর্তীতে সেই রূপ আরো প্রকট হয়ে উঠে। 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' নাটকগুলি বাংলা সাহিত্যের জগতে অভিনবত্ব গুণে গুণান্বিত হয়েছে। শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাটক সম্পর্কে বলছেন — ''সহজেই বোঝা যায়, মুক্তধারা বা রক্তকরবী'র প্রতীকপ্রয়োগ ঘটতে থাকে একটা পরিচিত সমাজকাঠামোর অন্তরবৃত্তে, তাই বাইরের সংঘর্ষ এখানে তুলনায় বেশি আসতে পায়।''[১৮] আমি প্রথম থেকে আলোচনা করে আসছি যে রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার ক্ষেত্রে নিজস্বতা রয়েছে। পাশ্চাত্যের রীতি তিনি প্রথমদিক থেকে অনুসরণ করলেও শেষপর্যায়ে যে নাটকগুলি লিখেছেন সেখানে কিন্তু দেখতে পাই নবরীতি। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্সকে তেমন অর্থে মানেন নি — ''রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, যদিও কিছু কিছু তর্জমা পড়েছি, গ্রীক নাট্য আমার অভিজ্ঞতার বাইরে।''[১৯]

নাট্যকারের অভিপ্রায়

নাট্যকার যে নাটক রচনা করেন তার একটি উদ্দেশ্য থাকে। সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করতে চান। সেটাকে কখনো গল্প, আকারে বড়ো হলে উপন্যাস, মহাকাব্য, কবিতা ও নাটক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাসকে নাটকে রূপ দিয়েছেন। এছাড়া একই কাহিনিকে নিয়ে উপন্যাস ও নাটক উভয় লিখেছেন। চোখে পরার মতো বিষয় হলো তিনি প্রথমে বর্ণাত্মক কাহিনি উপন্যাস লিখেছেন। শেষে সেই একই কাহিনিকে নাটকে পর্যভূষিত করেছেন। অবশ্যই এই পরিবর্তন সরাসরি হয়নি কোনো চরিত্রকে পরিবর্তন করেছেন কখনো শুধু নামের পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'বউ ঠাকুরানীর হাট' তাঁর প্রথম উপন্যাস যার নাট্যরূপ 'প্রায়াশ্চিত্ত'। অনেক পরে তিনি নাটকটি লেখেন। যাই হোক আমাদের আলোচনার বিষয়, একটি কাহিনিকে একভাবে বলে সাহিত্যিক তৃপ্তি পাননি কেন? এখানেই জরুরি হয়ে দাঁড়ায় পোয়েটিক্স গ্রন্থটি। সেখানে অ্যারিস্টট্ল নানা অধ্যায়ে নাটকের সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্য শাখার বিরাট পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। যেখানে মহাকাব্যের বিশাল আকৃতির কাহিনি থাকে। নাটকে থাকে এমন আকৃতির কাহিনি যার আদি-মধ্য-অন্ত থাকবে, যেটি অভিনয়ের সময় তার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। নাটক যেহেতু দৃশ্য কাব্য তাই তার কাহিনির মধ্যে ঐক্য থাকা প্রয়োজন — ''সমগ্র হল সেই জিনিস আদি আছে, মধ্য আছে আর শেষ আছে। যা কোন কিছুর পরবর্তী নয়, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই যার পরে কিছু আছে তা হল আদি। আবার যা অনিবার্যভাবে কোন কিছু পরবর্তী, কিন্তু তারপরে আর কিছু নেই, তা'হল শেষ।''[২০] একটি উপন্যাসের বিস্তৃতি এতো বৃহৎ যা অভিনয়ের উপযোগী নয়। তাই উপন্যাসের

© Santiniketan Sahityapath

কাহিনিকে নাট্যরূপ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিপ্রায় ছিল কাহিনিকে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা। যার ফলে অনেক ঘটনাকে একদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। প্রসঙ্গত 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' নাটক দুটি। অ্যারিস্টটলও বলেছেন কাহিনির সময়সীমা একটি সূর্য আবর্তনের মধ্যে শেষ হবে। রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অর্থে না হলেও অ্যারিস্টটলকে স্মরণ করেছেন। নিজে নাটক রচনার জন্য নাটকের মাধ্যমে নিয়ে অভিপ্রায় সিদ্ধ করার জন্য একাধিক নাটককে ভিন্নরূপও দিয়েছেন। 'প্রায়শ্চিত্ত' পরবর্তীতে 'পরিত্রাণ' রূপ লাভ করেছে। নাটকের নামকরণ চরিত্রের নামকরণ নিয়ে অনেক রকম করে ভেবেছেন। চারুচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলছেন — "১৩২৪ সালের ফাল্গুন মাসে এই নাটককে সংক্ষিপ্ত করিয়া অভিনয় উপযোগী এর সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার নাম রাখেন গুরু। প্রথমে যেদিন অচলায়তন নাটক পাঠ করেন, সেদিনই উহার নাম গুরু রাখিবার ইচ্ছা কবি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা অচলায়তন নামটিকেই অধিক সমর্থন করাতে তাহাই বহাল থাকিয়াছিল। এখন এই অচলায়তন শব্দটি বাংলা ভাষায় একটি বিশেষ গূঢ়ার্থক মূল্যবান শব্দ হইয়া উঠিয়াছে।"[২১]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, আমার প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাটকের আঙ্গিক বা গঠন বিন্যাস নিয়ে বেশ কয়েকটি কথা আলোচনা করা হয়েছে। আমরা জানি বহু বছর আগে অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্স বইতে নাট্যকারদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে গেছেন নাটকের আঙ্গিক বা গঠন ঠিক কিরূপ হবে। খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যে-সকল নাট্যকার নাটক রচনা করছেন তাঁরা পোয়েটিক্স গ্রন্থটিকে অনুসরণ করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি নাটক রচনার ক্ষেত্রে নিজস্বতা দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই। তাঁর এই ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনা অন্যান্য নাট্যকার থেকে তাঁকে আলাদা করে। এখানেই তাঁর বিশেষত্ব। প্রচলিত পাঁচ অঙ্কে বিন্যস্ত নাটকের গণ্ডি পেরিয়ে শুধু সংখ্যা বা দৃশ্য বিভাগ করে নাটক রচনা করলেন। তাই আমি আমার গবেষণার সূচিপত্র করেছি অ্যারিস্টটল কথিত ছয়টি উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে। কাহিনিকে নিয়ে বিশ্লেষণ, চরিত্রের অবস্থান, লেখকের অভিপ্রায়, দৃশ্যসজ্জা, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাটকের সংগীত ও অ্যারিস্টটল কথিত কোরাসের সঙ্গে মিল ও অমিল আলোচনা করে দেখব। সাধারণত সেখানে অ্যারিস্টটলকে তিনি সরাসরি তিনি অনুসরণ করেন নি। নিজের মতো করে তিনি ভেঙে গড়ে নিয়েছেন। আসলে রবীন্দ্রনাটকের আঙ্গিক বা গঠন বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করার মূল উদ্দেশ্য, তিনি যে আঙ্গিকে নাটক রচনা করেছেন, সমসাময়িক নাট্যকার ঠিক ভিন্ন আঙ্গিকে লেখালেখি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই স্বতন্ত্রতা তাঁকে অন্য নাট্যকার থেকে আলাদা করে। অ্যারিস্টটল নাটক লেখার ক্ষেত্রে ছয়টি উপাদানের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাটকের গঠনে ছয়টি অঙ্গ রয়েছে ঠিক তবে নাটক রচনা করার নিজস্ব রীতি রয়েছে। এই সত্যটি ব্যাখ্যা করাই আমার গবেষণামূলক আলোচনার মূল বিষয়।

তথ্যসূত্র:

১। 'কাব্যতত্ত্ব অ্যারিস্টটল অনুবাদ', শিশিরকুমার দাশ, প্যাপিরাস, সপ্তম মুদ্রণ ২০১৯, পৃ. ৫১
২। 'রক্তকরবী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা, প্রকাশ ১৪০৬, পৃ. ৭১
৩। 'রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা', উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, নবম সংস্করণ ১৪২৬, পৃ. ১২৮
৪। 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা, সংস্করণ মাঘ ১৪২৬, পৃ. ১১৬
৫। 'কাব্যতত্ত্ব', পৃ. ৫১- ৫২
৬। 'জীবনস্মৃতি', পৃ. ১৪৫
৭। 'রবীন্দ্রনাথ নাট্য পরিক্রমা', পৃ. ২৩০
৮। 'বিসর্জন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা, প্রকাশ ১৪০৬, পৃ. ৩২১-৩২২
৯। 'সাজাহান', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২৮১
১০। 'জনা', গিরিশচন্দ্র ঘোষ, প্রজ্ঞা বিকাশ, পৃ. ৯৫
১১। 'মুক্তধারা', পৃ. ২৭
১২। 'কাব্যতত্ত্ব', পৃ. ৩৫
১৩। 'রক্তকরবী', পৃ. ৮৯

© Santiniketan Sahityapath

১৪। ‘রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ’, প্রমথনাথ বিশী, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, অষ্টম সংস্করণ ২০২০, পৃ. ৯
১৫। ‘কাব্যতত্ত্ব’, পৃ. ৫৩
১৬। ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’, অজিতকুমার ঘোষ, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০১৮, পৃ. ১০
১৭। ‘জীবনস্মৃতি’, পৃ. ১১৬
১৮। ‘কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক’, শঙ্খ ঘোষ, সংস্করণ ২০২২, পৃ. ১০৯
১৯। ‘কাব্যতত্ত্ব’ পৃ. ১০
২০। ওই, পৃ. ৫৪
২১। ‘রবি রশ্মি’, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দে’জ পাবলিশিং, সংস্করণ ১৪২৭, পৃ. ১২২

———

Prantik Gabeshana Patrika

© Santiniketan Sahityapath